Rajshahi University journal of arts & law Vol. 52 (2024) pp. 55-70
ISSN 2309-0898 (Print), 2408-8773 (Online)
https://doi.org/10.64102/rujal.0710

নজির আহমদ ও তার উপন্যাসের বিষয় বৈচিত্র্য

[Thematic Diversity of Nazir Ahmad’s Novel]

মো. রেজাউল করিম*

Abstract

Moulvi Nazir Ahmad Dehlvi, also known as "Deputy” Nazir Ahmad, was the first Novelist of literature. Nazir Ahmad was born in 1831 to a family of scholars in Rehar village, U.P. in India. Deputy Nazir Ahmed is the first novelist in Urdu literature. Because of his pragmatic and contemporary novels he is well known to the people in society. Prior to him, imaginary and unreal novels existed in Urdu literature. He has written 7 novels in Urdu literature. Binat-un-Nash, Mirat-ul-Uroos, Taubat-un-Nashuh, Fasana-e-Mubtala, Ibnul Wakth, Ayyama and Ruya-e-Sadikah etc. The themes of the novels are given below shortly. The idea of female education is a core theme of the novels. That is done by giving lessons in general education and physical sciences through conversations between a teacher and her student. This publication was also a great success. This was the time when Ahmad's writings became a mode of guidance for the girls of Muhammadan families. The author talks about how the former habits of the father led to the eldest son's are spoiled. Ahmad Nazir through his story and novels highlight the importance of grooming and disciplining kids as they are growing up. Simultaneously, he stresses to the youth to heed the advice of their elders. Ahmad tried to light up consciousness in girls about the discipline of housekeeping. Even this novel was owned by The British rule, and they published it in keeping large number.

***Keywords*:** Nazir Ahmad, Novel, Lifestyle, Social reform, Muslim society.

ভূমিকা

উর্দু সাহিত্য তথা উর্দু গদ্য সাহিত্য যাদের পদচারণায় উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল তাদের মধ্যে ডেপুটি নজির আহমদ অন্যতম। তিনি শুধু একজন ঔপন্যাসিকই ছিলেন না বরং একজন নারীশিক্ষার অগ্রনায়ক,বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, ইসালামি চিন্তাবিদ, প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ও স্যার সৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলনের একজনপথিকৃৎ ছিলেন। নজির আহমদের পূর্ববর্তী উর্দু সাহিত্যের বিষয়বস্তু ছিল ভূত-প্রেত, রাক্ষস, দৈত্য-দানব, রাজপুত্র-রাজকন্যার অলিক প্রেমকাহিনীতে ভরপুর। নজির আহমদ প্রথম ব্যক্তি যিনি অবাস্তব কাহিনী থেকে বেরিয়ে এসে উর্দু সাহিত্যে নিয়মতান্ত্রিক বাস্তব জীবন কেন্দ্রীক চিত্তাকর্ষক কাহিনী সৃষ্টি করে উপন্যাস উপস্থাপন করেছেন। তাঁর উপন্যাস হল- তৎকালীন সমাজের বাস্তব চিত্র।

জন্ম ও বংশ

আধুনিক উর্দু সাহিত্য যাদের দ্বারা উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছে তাদের মধ্যে শামসুল উলামা ডেপুটি নজির আহমদ অন্যতম। তাঁর প্রকৃত নাম নজির আহমদ। তিনি ইংরেজ কর্তৃক শামসুল উলামা উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ১৮৩১ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন[১]। মাহমুদ বেরলভী তাঁর জন্মসন ১৮৩৬ উল্লেখ করেছেন[২]। “তারিখে আদাবে উর্দু” গ্রন্থের লেখক

* অধ্যাপক, উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ; ই-মেইল: dr.rezaul@du.ac.bd

রামবাবু সাকসিনা তার জন্ম সন ১৮৩২ বলে মতামত দিয়েছেন[৩]। নজির আহমদকে আধুনিক উর্দু উপন্যাসের প্রথম ঔপন্যাসিক বলে গণ্য করা হয়। এছাড়াও তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক, নারী শিক্ষার অগ্রদূত, সমাজ সেবক, প্রভাবশালী একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর পিতা মৌলভী সাআদাত আলী খান আরবি ও ফারসির একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি শিক্ষিত ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। নজির আহমদ তাঁর নানা কাজি গোলাম শাহ আলীর বাড়িতে চার বছর লালিত-পালিত হন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর পিতার সাথে বেজনৌরে বাবার পৈতৃক বাড়িতে চলে আসেন।[৪]

শিক্ষাজীবন

নজির আহমদ তাঁর পিতার সাহচর্যে নিজ বাড়িতেই নয় বছর বয়স পর্যন্ত আরবি,উর্দু ও ফার্সির প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে বেজনৌরের ডেপুটি কালেক্টর মৌলভী নসরুল্লাহর নিকট নাহু, সরফ ও দর্শন শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেন। মৌলভী নসরুল্লাহর পরামর্শে নজির আহমদের পিতা তাঁকে উচ্চ শিক্ষার জন্য দিল্লিতে পাঠিয়ে দেন। সেখানে আওরঙ্গবাদী মসজিদ সংলগ্ন মাদরাসায় ডেপুটি নজির আহমদ মৌলভী আব্দুল খালিকের তত্ত্বাবধানে আরবি ভাষা শিক্ষা অর্জন করেন এবং ঐ মাদ্রাসার রেওয়াজ অনুযায়ী মহল্লার বাড়ি বাড়ি থেকে রুটি ও অন্যান্য খাবার সংগ্রহ করে সবাই মিলে খেতেন। এ ব্যাপারে নজির আহমদের বক্তব্য নিম্নরূপঃ

پڑھنے کے علاوہ میرا کام روٹیاں سمیٹنا بھی تھا۔ صبح ہوئی میں چھڑی ہاتھ میں لیکر گھر گھر روٹیاں جمع کرنے نکلا ۔[৫]

(এছাড়া আমার কাজ ছিল রুটি একত্রকরণ। সকাল হওয়ার সাথে সাথে আমি লাঠি হাতে নিয়ে বাড়ি বাড়িথেকে রুটি যোগাড় করার জন্য বেরিয়ে পড়তাম।)

পরবর্তীতে দিল্লী কলেজের স্বনামধন্য আরবি বিষয়ের অধ্যাপক মামলুক আলীর সহযোগিতায় দিল্লী কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে শিক্ষা বৃত্তি লাভ করেন। এ কলেজ থেকেই তিনি দীর্ঘ দশ বছর যাবত দর্শন, আরবি সাহিত্য ও অংক শাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করেন। এ কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি মুহাম্মদ হোসাইন আজাদ, আলতাফ হোসাইন হালী, মৌলভী সাআদাত আলি, শেখ জিয়া উদ্দীন, মৌলভী যাকাউল্লাহ, কানাইলাল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সংগে পরিচিতি লাভ করেন। দিল্লী কলেজেও উপরিউক্ত ব্যক্তিবর্গের সাহচর্যে এসে তিনি পুরাতন ধ্যান-ধারণাপূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি, প্রাচীনপন্থিদের গতানুগতিক চিন্তাধারা পরিত্যাগ করেন এবং আধুনিক ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেন। ফলে তাঁর মধ্যে প্রাচীন ও আধুনিক ভারধারা ও চিন্তাধারার এক সুন্দর সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়[৬]। সেখান থেকে তিনি ১৮৫৩ সালে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কর্মজীবন

শিক্ষাজীবন শেষ করেই মৌলভী নজির আমহদ প্রথমে শিক্ষকতা পেশার মাধ্যমে কর্মজীবনে পদার্পণ করেন। গুজরাট জেলার কুলজায় একটি স্কুলে মাত্র ৪০ টাকা মাসিক বেতনে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। অল্প সময়ের মধ্যে সেখান থেকে ইস্তফা দিয়ে ১৮৫৭ সালে মাসিক একশত টাকা বেতনে কানপুরে ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে যোগদান করেন এবং কানপুরে চলে আসেন। সেখানে এসে নিজ দায়িত্ব পালনের সময় স্কুলের ক্যাপ্টেন ফ্লুরের সাথে মনমালিন্য হওয়ায় চাকরি থেকে ইস্তফাপত্র দিয়ে দিল্লীতে চলে আসেন[৭]। এ সময় সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয় এবং বিদ্রোহের অভিযোগে তিনি গ্রেফতার হন। পরে শ্বশুর বাড়ির সহায়তায় তিনি লিসন নামক এক ইংরেজ মহিলার প্রাণ রক্ষা করেন। এক লাশের স্তুপ থেকে ইংরেজ মহিলা লিসনকে জীবিত বের করে তোলেন ও প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে লিসনকে

ইংরেজদের ক্যাম্পে পৌঁছে দেন। ফলে প্রতিদান স্বরূপ ইংরেজ সরকার তাঁকে নগদ অর্থ ও স্বর্ণপদক প্রদান করেন এবং স্কুলসমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতি দিয়ে এলাহাবাদ পাঠান। দিল্লি কলেজে অধ্যয়নকালে অধ্যক্ষ মি: টেলরের উৎসাহে তিনি ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ করেন কিন্তু তার পিতার বিরোধিতার কারণে ইংরেজি শিক্ষা সম্ভব হয়নি। তিনি এলাহাবাদে কর্মরত অবস্থায় ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং কয়েকটি ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদও করেন। তৎকালীন যুক্ত প্রদেশের গভর্নর উইলিয়াম মিউর নজির আহমদকে "*ইনকাম ট্যাক্স এ্যাক্ট*" গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ করার দায়িত্ব দেন। তিনি অত্যন্ত সাবলিলভাবে অনুবাদ সম্পন্ন করায় তাকে ইন্ডিয়ান প্যানেল কোড ভারতের "*দণ্ড সহিংসতা*" গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ করার জন্য ১৮৬২ সালের দায়িত্ব দেয়া হয় এবং এ লক্ষ্যেএকটি বোর্ড গঠন করা হয়। সেই বোর্ডের প্রধান অনুবাদক হিসেবে ডেপুটি নজির আহমদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। আর এ অনুবাদকেই "*মজমুয়া-ই-তাজিরাতে হিন্দ*" বলা হয়। এ সকল অনুবাদের মাধ্যমে নজির আহমদ একজন স্বনামধন্য অনুবাদক হিসাবে ইংরেজ সরকার ও ভারতের জনগণের কাছে সমাদৃত হন। এ কারণে উইলিয়াম মিউর তাঁকে প্রথমে তহসীলদার এবং পরে ১৯৬২ সালে জরিপ বিভাগেরডেপুটি কালেক্টর পদে নিয়োগ দান করেন। এ পদে তিনি প্রথমে কানপুর, গোরক্ষপুর, জলিয়ান ও সর্বশেষ আজম গড় জেলায় দায়িত্ব পালন করেন। আজম গড়ে থাকাকালীন তিনি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক ইংরেজি গ্রন্থ হেভেন এর অনুবাদ করেন "*সামাওয়াত* " নামে। গ্রন্থটি অনুবাদে খুশি হয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রথম সলার জং ১৮৭৭ সালে তাঁকে মাসিক অর্ধশত টাকা বেতনে "*সেটেলমেন্ট অফিসার*" পদে নিয়োগ দেন। এ পদে থাকাকালীন তাঁর নিরলস পরিশ্রম, সততা ও কর্তব্য নিষ্ঠার কারণে মাসিক সতের শত টাকা বেতনে রিভিনিউ বোর্ডের সদস্যপদ লাভ করেন[৮]। সেখানে চাকরীরত অবস্থায় তিনি স্যার সলার জং এর নির্দেশে শিক্ষা বিভাগের জন্য একটি তালিকা তৈরি করেছিলেন। সরকারি চাকুরি সমাপ্ত করে দিল্লীতে চলে আসেন এবং সেখানে সাহিত্য, শিক্ষা সংস্কার ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তৎকালীন ইংরেজ সরকার কর্তৃত ১৮৯৭ সালে তিনি "*শামসুল ওলামা*" খেতাবে ভূষিত হন। ১৯০২ সালে এডেনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল,এল, ডি ডিগ্রি অর্জন করেন।১৯১০ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি.ও. এল (Doctor of oriental learnig) সনদ প্রদান করে।[৯]অবশেষে উর্দু উপন্যাস সাহিত্যের স্থপতি, শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক এই মহান ব্যাক্তি ১৯১২ সালে পরলোকগমন করেন।[১০]

রচনাবলি

নজির আহমদ শুধু উপন্যাসের মাধ্যমেই তৎকালীন ভারতবর্ষের মানুষের উন্নতি সাধন করেননি বরং তিনি সুদীর্ঘ সময় ধরে উপন্যাস ছাড়াও নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ সাহিত্য সম্পাদনের মাধ্যমে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেছেন। নিম্নে সংক্ষেপে তাঁর রচনাবলির পরিচয় তুলে ধরা হল:

উপন্যাস: ডেপুটি নজির আহমদ এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি সর্বপ্রথম বাস্তবজীবন ও সমাজ সংস্কারমূলক উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর পূর্বে উর্দু সাহিত্যে বাস্তব কেন্দ্রিক উপন্যাসের সন্ধান পাওয়া যায় না। তিনি পূর্ণাঙ্গ ৭টি উপন্যাস লিখে উর্দু সাহিত্যে এক অভূতপূর্ব অবদান রাখেন।

১. ***মেরাতুল উরুস*** (مرأة العروس): এটি নজির আহমদের প্রথম উপন্যাস। এটি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। জানা যায় যে, গ্রন্থটি তিনি তাঁর মেয়েদের নৈতিক শিক্ষা দেয়ার জন্য রচনা করেছিলেন। দৈনন্দিন জীবনের কাজ-কর্ম ও গৃহস্থালির ব্যবস্থাপনার কৌশলাদি বর্ণনা করেছেন এ গ্রন্থে।

২. ***বানাতুল না'আশ*** (بنات النعش): এ উপন্যাস ১৮৭৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। তার *মেরআতুল উরুস* উপন্যাস রচনার সময় কিছু অংশ অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়। ফলে বানাতুন না'আশ উপন্যাসে ঐ সব বক্তব্য সন্নেবেশিত করা হয়। এ কারণে অনেকে বানাতুন না'আশ উপন্যাসটিকে *মেরআতুল উরুস* উপন্যাসের অংশ বলে গণ্য করেছেন।

৩. ***তাওবাতুন নাসূহ*** (توبۃ النصوح): এ উপন্যাসটি নজির আহমদের একটি সংস্কারমূলক উপন্যাস। সন্তানদের সুন্দর আচার-আচারণ ও ধর্মীয় শিক্ষার বর্ণনা দিয়ে উপন্যাসটি ১৮৭৭ সালে রচনা করা হয়।

৪. ***ফাসানা-এ- মুবতালা*** (فسانہ مبتلا): ফাসানা শব্দের অর্থ হল- কাহিনী, ঘটনা বা আখ্যান। আর মুবতালা অর্থ বিপদাপন্ন। উপন্যাসটি তিনি ১৮৮৫ সালে রচনা করেন। এ উপন্যাসটির প্রধান চরিত্রের নাম মুবতালা। একাধিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যে কোন লোকের জন্য ভাল নয় বরং ক্ষতিকর। এ সম্পর্কে তিনি উপন্যাসটি রচনা করেছেন।

৫. ***এবনুল ওয়াকত*** (ابن الوقت) : এটি নজির আহমদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য উপন্যাস। যা ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি নিজ আচার-আচরণ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচার বাদ দিয়ে ইংরেজদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, পোষাক-পরিচ্ছেদ, সামাজিক রীতি-নীতির অনুসরণ না করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন এবং এর ক্ষতিকর ও খারাপ দিকগুলো তুলে ধরেছেন। কেউ কেউ উপন্যাসটি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবার কেউ কেউ এটিকে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

৬. ***আয়্যামা***(ایامی) : আয়্যামা উপন্যাসটি ডেপুটি নজির আহমদ তৎকালীন সমাজে বিধবাদের দ্বিতীয় বিবাহের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন আযাদী চরিত্রের মাধ্যমে। এটি ১৮৯০ সালে রচনা করেন। এ উপন্যাসটির প্লট ও চরিত্র বিন্যাস অবকাঠামো অত্যন্ত চমৎকার।

৭. ***রুইইয়ায়ে সাদেকাহ*** (رویاۓ صادقہ): রুইইয়ায়ে সাদেকাহ উপন্যাসটি নজির আহমদের একটি সংস্কারমূলক উপন্যাস। ১৮৯২ সালে মতান্তরে ১৮৯৪ সালে এটি প্রকাশিত হয়। তিনি আধুনিক শিক্ষার ক্রুটি-বিচ্যুতি, আলীগড় কলেজের দুর্বল দিকগুলো এ উপন্যাসে আলোকপাত করেছেন। এছাড়া মুসলিম সমাজের সম্ভ্রান্ত ধনীর সন্তানদের বিলাসিতাপূর্ণ জীবন-যাপন, চিন্তা-ভাবনা, কর্ম ও আচার ব্যবহারের কাহিনী এ উপন্যাসে আলোচনা করেছেন[১১]।

অন্যান্য গ্রন্থ

তিনি মুন্তাখাবুল হিদায়াত (১৮৬৯) *মাও' ইযায়ে হাসানাহ* (১৮৮৭), *আলহুকূক ওয়াল ফারায়িয* (১৯০৬ ইং) *আদইয়াতুল কুরআন*, *উম্মাহাতুল উম্মাহ*, *মাতালেবুল কুরআন*, *দাহসুবাহ*, *ইজতেহাদ*, *তরজমায়ে কানুন* ইত্যাদি অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া তাঁর ৭টি শিক্ষামূলক গ্রন্থ, ৩টি অনুবাদ গ্রন্থ, ৩টি কাব্যগ্রন্থ, ২টি ভাষণ ও বক্তৃতা সংকলন বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়[১২]।

উপন্যাসের বিষয় বৈচিত্র্য

উপন্যাস হল বাস্তব জীবনের চালচলন ও রীতি-নীতির প্রতিচ্ছবি।[১৩] উপন্যাস শব্দটি 'উপনয়' বা উপন্যস্ত শব্দ থেকে উদ্ভূত। যা ইংরেজি Novel শব্দের প্রতিশব্দ। যার বাংলা অর্থ গল্প, উপন্যাস বা আখ্যান।[১৪] উপন্যাসের সৃষ্টি যদিও পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে সাধিত হয়েছে। কিন্তু এর বিকাশ সাধিত হয় ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যে। এই ধারাবাহিকতায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের গণ্ডি অতিক্রম করে উনবিংশ শতাব্দীর

শেষার্ধে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যে এ শিল্পের বিকাশ হয়।এভাবে উর্দু সাহিত্যেও উপন্যাসের সৃষ্টি হয়। প্রথম ঔপন্যাসিক হিসাবে ডেপুটি নজির আহমদ-ই উর্দু উপন্যাসের সূচনাকারী।

উপন্যাসের গঠন বা অবকাঠামোর নির্মাণশৈলী ও শিল্পরূপ ছাড়াও বিষয়বস্তু নিরূপণ অত্যাবশ্যক। বিষয়বস্তু একটি সার্থক উপন্যাসের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক উপন্যাসের একটি কেন্দ্রীয় বা প্রধান বিষয় বস্তু থাকে যা দশটি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়[১৫]। ঔপন্যাসিক তার রচনার বিষয়বস্তুর মাধ্যমেই সামজের বাস্তবধর্মী ঘটনাপ্রবাহ, অভিব্যক্তি, অনুভূতি ও চিন্তাধারা বৃহত্তর পরিসরে সংক্ষিপ্ততার সাথে উপস্থাপনা করে থাকে। গঠন ও অবকাঠামোর তুলনায় উপন্যাসের বিষয়বস্তু অধিকতর গুরুত্বের দাবিদার। একারণে উপন্যাসের বিষয়বস্তুই হচ্ছে একটি সার্থক উপন্যাসের মূলভিত্তি।[১৬]

ডেপুটি নজির আহমদ (১৮৩১-১৯২২ ইং) উর্দু সাহিত্যের অবাস্তব ও কাল্পনিক বিষয় কেন্দ্রিক উপন্যাসের পরিবর্তে সর্বপ্রথম বাস্তব জীবন ও সংস্কারমূলক উপন্যাসের সূচনা করেন। তার উপন্যাসের গঠন ও বিষয়বস্তু তৎকালীন সময়ের মানব জীবনের প্রতিচ্ছবি।[১৭]তার উপন্যাসগুলি তৎকালীন সমাজের সব মানুষের নিকট পরিচিত। তিনি উপন্যাস এর মাধ্যমে আধুনিক বা বাস্তবমুখী সমাজ ও পরিবার সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়া তিনি ধারণা পোষণ করতেন যে, পরিবারই সভ্যতার উৎস। তিনি কোন জাতিকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হলে সর্বাগ্রে পরিবারকে শিক্ষিত করে তোলার প্রতি অত্যন্ত জোরালোভাবে গুরুত্বারোপ করেন। সার্থক ও উন্নতমানের সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে তিনি নারী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। ফলে নারীদের মধ্যে স্বাবলম্বি ও স্বাধীনচেতা মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। নজির আহমদের সমাজ সংস্কার মূলক ও বাস্তবধর্মী উপন্যাসের প্রভাবে মাধ্যমে তৎকালীন সমাজে অশিক্ষা, বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ এবং নারীদের মধ্যে সচেতনাবোধ জাগ্রত হয়।[১৮]তাঁর সব উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও অবকাঠামোর মধ্যে দাস্তানের নমুনা পাওয়া যায়। নিম্নে তার উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তু তুলে ধরা হল:-

মেরাতুল উরুস(مرآة العروس):"*মেরাতুল উরুস*" একটি পারিবারিক উপন্যাস। সিপাহী বিদ্রোহের পর মুসলমানদের সাময়িক অবস্থার পাশাপাশি ভারতের একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পারিবারিক জীবনের ঘটনাবলী তুলে ধরা হয়েছে। তিনি এখানে তাঁর মেয়েদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াবলীকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। নজির আহমদ উপন্যাসের মাধ্যমে বাচ্চাদের ধর্মীয় শিক্ষা, নারীদের গৃহস্থালী কর্ম ব্যবস্থাপনার কৌশল,ঘরোয়া জীবনের সুখ-শান্তি, সংসার সাজানো ও নারীদের আচার-আচরণের ভুলগুলো সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেছেন।[১৯] তিনি এ উপন্যাসে দুই বোন আকবরি ও আসগরি চরিত্রের মাধ্যমে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের জীবন পদ্ধতি, সদাচারণ, ঘরোয়া, জীবন-যাপনের শিক্ষা প্রদান করেছেন। উপন্যাসটিতে মোট ৩৩টি পরিচ্ছেদ রয়েছে যার মধ্যে নারীদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, আকবরি বিয়ের পরে স্বামী মুহাম্মদ আকেলকে পিতা থেকে আলাদা হবার পরামর্শ, আকবরির খারাপ আচরণ, বিয়ের পর আসগরির পরিবর্তন, মামা আজমতের দুষ্টামি, আসগরির খাবার তৈরীর প্রস্তুতি, মোহাম্মদ কামেলের ভিন্ন জায়গায় যাওয়া, মাহমুদার বিবাহ, সন্তানদেরকে চিঠি প্রদান ও দীর্ঘ উপদেশ ইত্যাদি ঘটনাবলি। ২৫৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত উপন্যাসটির প্রায় ৪০ পৃষ্ঠাব্যাপি নারী শিক্ষা, নারী জাগরণ ও সমাজে নারীর প্রয়োজনীয়তার কথা ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন[২০]।

উপন্যাসের কাহিনী

দিল্লীর সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান দুরান্দেস খানের দুই মেয়ে। ছোট মেয়ের নাম আসগরিও বড় মেয়ের নাম আকবরি। আসগরি এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। আকবরি নানির অতিরিক্ত প্রশ্রয়ে স্বার্থপর ও বদমেজাজি হয়। ফলে সে কারো সাথে ভাল ব্যবহার করেনা। এমনকি সে লেখা পড়া না করে পাড়ার খারাপ ছেলে মেয়েদের্ সাথে আড্ডা ও খেলাধুলায় মত্ত থাকে। ধর্মীয় কাজে মনোযোগ ছিল না ফলে সে নামায-

রোজাও করতো না। অপরপক্ষে তার ছোট বোন আসগরি ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আসগরি সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে, সকলের সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং সংসারধর্মী হয়ে উঠে। আসগরি ছোটকাল থেকেই কুরআন শরীফের অনুবাদসহ ধর্মীয় বই পড়তো।

আসগরি ভালো আচরণের মাধ্যমে নিজ পরিবার ও প্রতিবেশী সবার কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সবাই আসগরীকে পছন্দ করলেও আকবরী তাকে মোটেও পছন্দ করতো না। এরপরও আসগরি তাকে সম্মান করত এমনকি আকবরির খারাপ আচরণের কথা বাবা মাকে বলত না। এমতাবস্থায় তাঁদের পিতা দুরান্দেশ তার বন্ধু ফাজিলের দুই ছেলের সাথে অর্থাৎ বড় মেয়ে আকবরীর সাথে মোহাম্মদ আকেল ও ছোট মেয়ে আসগির সাথে মোহাম্মদ কামেলের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করান[২১]। বিয়ের পর থেকে আকবরি স্বামী, শ্বশুর ও ননদের সাথে খারাপ আচরণ করে এবং স্বামীকে কুপরামর্শ দিয়ে তাকে পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার জন্য বলে। তখন আকেল আকবরিকে বুঝাতে গেলে সে তাঁর কথার উত্তর দেয় এভাবে।

منہ سے زبان سنبھال کر بولا کرو نہیں تو پیٹ پیٹ کر اپنا خون کر لوں گی۔[২২]

(মুখ সামলিয়ে কথা বলো নইলে (তোমাকে হত্যা করে) উদরভরে তোমার রক্ত পান করবো।)

একদিন মোহাম্মদ আকেল বন্ধুদের ইফতারির দাওয়াত দিলে সে মেহমানদের খাবার ব্যবস্থা না করে বেপর্দা ভাবে তাঁদের সামনে চলাফেরা করে। ফলে বন্ধুদের কাছে আকেলকে অপমানিত হতে হয়। রোজা শেষে আকবরির স্বামী আকবরির জন্য জামা-কাপড় ও নতুন চুড়ি নিয়ে আসলে সে তা পছন্দ করে না। এমনকি ঈদের দিন বাড়ির সবাই ঘুম থেকে উঠলেও আকবরি ঘুম থেকে উঠে না। তার ননদ মাহমুদা আকবরিকে ঘুম থেকে উঠতে বললে সে মাহমুদাকে চড় মারে। মাহমুদা কান্না করলে আকেল তাকে জিজ্ঞাসা করে তোমার কী হয়েছে? মাহমুদা তাকে আকবরির আচরণের কথা বললে সে অস্বীকার করে ও এভাবে বলে:

دیکھو چھوٹی نامراد ۔ اب تو دوڑتے ہیں گری اور میرا نام لگاتی ہے ۔ [২৩]

(দেখো ছোটো ননদ! তুমি নিজে দৌড়ে গিয়ে নিচে পড়ে গিয়েছ অথচ আমার নামে দুর্নাম করছ।)

তার এরকম আচরণের জন্য স্বামী আকেল রেগে যায় এবং আকবরিকে কিছু না বলে মাহমুদাকে আদর করে সে ঈদের নামাজে চলে যায়। আকেল ঈদের নামাজ থেকে ফেরার পূর্বেই আকবরি বাপের বাড়িতে যাওয়ার জন্য বের হয়ে পড়ে। তখন শ্বাশুড়ী আকবরির যাওয়ার সময় স্বামীকে বলে যাওয়ার কথা বললে আকবরি এভাবে জবাব দেয়:

اتنا کہ کر مولن کنجرن سے ڈولی منگوا یہ جا وہ جا ۔[২৪]

(শ্বাশুড়ির কথা মূল্যায়ন না করে) আকবরি বাপের বাড়ী যাওয়ার জন্য ডুলি ডেকে নিয়ে চলে গেল।)

আকবরি বাপের বাড়িতে চলে যায় পরবর্তীতে আকেল তাকে ফিরিয়ে আনতে চাইলে সে আকেল কে পিতামাতা থেকে আলাদা হতে বলে। ফলে স্ত্রীর কথা রাখতে গিয়ে আকেলকে পিতামাতার কাছ থেকে আলাদা হতে হয়। নিজের সংসার আলাদা করার পরও সে সংসারের কোন কাজকর্ম করে না, ফলে সংসারে অশান্তি লেগেই থাকে। অপর দিকে আকবরির ছোট বোন আসগরি ছিল পুরো উল্টো স্বভাবের। সে নম্র-ভদ্র ও শান্ত প্রকৃতির ছিল এবং সংসারের কাজ- কর্মে ছিল অত্যন্ত দক্ষ। শ্বশুর বাড়িতে এসে ভালো আচরণের মাধ্যমে সে সবার মন জয় করে নেয়। আসগরি তার পিতামাতার পরামর্শে শ্বশুর-শ্বাশুড়ি ও ননদ

মাহমুদাকে আদর-যত্ন করে আপন করে নেয়। এভাবে সংসারের সকল কাজ-কর্ম আসগরির ইচ্ছে মত হতে থাকে। কিন্তু মামা আজমত সংসারের জিনিসপত্র এদিক ওদিক করত। আসগরি বুদ্ধিমত্তার সাথে মামা আজমতের সকল অসৎ কর্মের বিষয়ে শ্বাশুড়ি ও স্বামীকে জানায়। অপরদিকে আকবরি পুরো ঘটনাকে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করে আসগরির চরিত্রে কালিমা লেপনের অপচেষ্টা করে।

বানাতুননন'শ (بنات النعش) : এ উপন্যাসে মেরাতুল আরুস উপন্যাসের মূল চরিত্র আসগরি সম্পর্কে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। খারাপ চরিত্রের হুসন নামে একটি মেয়ে স্কুলে ভর্তি করে তার মধ্যে খারাপ অভ্যাসগুলোকে দূর করার চেষ্টা করেন আসগরি ও তার ননদ মাহমুদা। হুসন আকবরির চেয়েও বেশি খারাপ চরিত্রের হলেও তাঁকে সঠিক শিক্ষা দিয়ে সৎগুণ বিশিষ্ট মেয়ে হিসাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয় আসগরি।[২৫]

মূলতঃ উপন্যাসটিতে নারী শিক্ষার গুরুত্ব, উন্নত চরিত্র গঠন ও নিজের কাজ নিজে করা, ভোরে উঠা, খারাপ ব্যবহার থেকে বিরত থাকা ও ক্ষমাশীলতা সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।[২৬] গোপনে দান করা, কাজের লোকের সাথে ভালো ব্যবহার করা, কসম না খাওয়া, ধৈর্য্য ধারণ করা ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া এ উপন্যাসে নজির আহমদ জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। অর্থাৎ শরীরচর্চা, মধ্যাকর্ষণ শক্তি, আবহাওয়া, জলবায়ু, চুম্বক, ঝড়-বৃষ্টি, বিশ্বসভ্যতা, পৃথিবীর আকৃতি ভৌগোলিক অবস্থা, পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের মানচিত্র, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, সাগর-মহাসাগর, বিশ্ব সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে[২৭]।

কাহিনী

উপন্যাসটির প্রথমাংশে হোসনে আরা অত্যন্ত খারাপ মেয়ে হিসাবে সবার সাথে গন্ডোগল করত ফলে কারো সাথে তার মিল ছিল না, সে বাবা-মাসহ কাউকে সম্মান করতনা। এমনকি হোসনেআরা নিজেকে সুন্দর মনে করত এবং অন্যান্য মেয়েদের চেহারা সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করত। এমতাবস্থায় হুসনেআরার মা সুলতানা বেগম তার মেয়ে নিয়ে চিন্তিত হলে খালা শাহজমানি আসগরিকে হুসনেআরা শিক্ষক হিসাবে ঠিক করে তার বিদ্যালয়ে হুসনেআরাকে রেখে আসেন। এ সময় হুসনেআরার বয়স মাত্র ১১ বছর ছিল। মাত্র ১৪ বৎসর বয়সেই হুসনেআরাকে ১টি বই দেওয়া হয়। তিন বৎসরের মধ্যে হুসনেআরা তাঁর শিক্ষিকা আসগরির সংস্পর্শে এসে কোরান শরীফ তরজমাসহ সহজেই লিখতে ও পড়তে শেখে। এছাড়া ভারতের ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থা, রান্না-বান্নাসহ অন্যান্য বিষয়েও জ্ঞান অর্জন করে। এ ব্যাপারে আসগরির অবদান ছিল অপরিসীম। এ অল্প সময়েই হুসনেআরার আচরণের মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য ওপরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় আসগরি তা বানাতুনর্নাস গ্রন্থটি রুপে তা তুলে ধরেন। প্রথম দিন হুসনেআরাকে দেখেই আসগরি বুঝতে পেরেছিল যে,কাজের মেয়েরাই তাকে অত্যন্ত তোষামদ করে খারাপ করে তুলেছে। হুসনেআরা যে অত্যন্ত মেধাবী ছিলো তা আসগরি প্রথম দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন।[২৮] তাই আসগরির নির্দেশে সকল কাজের মেয়েকে বিদায় করে দেওয়া হয়। হুসনেআরা ধনী পরিবারের সন্তান হওয়ায় বিদ্যালয়ের অন্যান্য মেয়েকে নিচু দৃষ্টিতে দেখতএবং তাদের সাথে খারাপ আচরণ করত। বিদ্যালয়ে এসে প্রথম দিন থেকেই সে সব মেয়েকে ক্রীতদাসী মনে করে হুকুম দিত। এ প্রসঙ্গে নজির আহমদ এভাবে লিখেছেন–

একদা মাহমুদা নিজের তৈরী পুতুল দেখানোর জন্য ঘরে নিয়ে গেলে সে মুগ্ধ হয়ে যায়। যদিও হুসনেআরার বাড়ীতে এগুলোর চেয়ে অনেক দামী পুতুল ছিল। মাহমুদার এসব কাজ দেখে হুসনেআরার মনে শেলাই শেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। একাজে পরিশ্রমের কথা ভেবে হুসনেআরা ঘাবড়িয়ে গেলে মাহমুদা তাকে পরিশ্রম করার সাহস জোগায়। মাহমুদা হুসনেআরা কে বলে যে দুনিয়াতে অর্থ সবকিছু নয় কারণ টাকাই শুধু মানুষের জীবনে পরিতৃপ্তি আনতে পারে না। ফলে হুসনেআরার নিজের কাজ নিজে করার

বিষয়ে আগ্রহের সৃষ্টি হয়। এভাবেই মাহমুদার সংস্পর্শে এসে অন্যান্য কাজকর্মের পাশাপাশি লেখাপড়া শুরু করে। এভাবে সে মাহমুদার কাছে সঠিক শিক্ষা অর্জন করে নিজেকে সুবিবেচক মানুষ হিসাবে গড়ে তোলে। স্বল্প সময়ের মধ্যে হুসনেআরা বিশ্বের প্রয়োজনীয় বিষয়ে জ্ঞান-অর্জনসহ রান্না-বান্নায় পরিপক্ক হয়ে উঠে। সে প্রকৃত গুণসম্পন্ন মানুষ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং বিয়ের প্রস্তুতি শুরু করে কিন্তু হুসন আরার জন্য বিদ্যালয় পরিত্যাগ করা ছিল কঠিন। ফলে বিদ্যালয়ের সকল মেয়ে মিলে হুসনেআরাসহ তাদের সকলের মাকে দাওয়াত দেওয়ার ব্যবস্থা করলে আসগরি এ ব্যাপারে একটি ভাল অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই আসগরি হুসনেআরাকে বানাতুন না'শ গ্রন্থটি উপহার দেয়। সাথে সাথে সকল মেয়েরা তাদের তৈরী একটি পোশাক পুরস্কার হিসাবে প্রদান করে। হুসনেআরাকে এভাবে প্রকৃত গুণসম্পন্ন মানুষরূপে বিদ্যালয়টি থেকে বিদায় দেওয়া হয়।

آخر حسن آرا کھسیاتی ہو کر اپنا سامنا لیکر رہ گی مگر پہلے ہی دن سے امیری کے
شروع کیا کہ گویا سب [৩০]زعم میں حسن آرا نے مکتب میں اپنا ایسا تسلط بیٹھانا)
لڑکیاں اس کی لو نڈیاں ہیں اور بے تکلف لگی سب پر حکم چلانے

(অবশেষে হুসনেআরা দু:খ ভারাক্রান্ত হয়ে নিজেকে সামলিয়ে সেখানে অবস্থান করলেন। কিন্তু পরবর্তীতে প্রথম দিন থেকেই হুসনেআরা আত্মগোপন ও সর্দারী মনভাব নিয়ে বিদ্যালয়ে এমনভাবে একতান্ত্রিক শাসন শুরু করে এবং সে মনে করে, সব মেয়ে তার ক্রীতদাসী এবং তার নির্দেশ মতো চলবে।)

তাওবাতুন নাসুহ (توبۃ النصوح) :তাওবাতুন নাসুহ (১৮৭৭) ডেপুটি নজির আহমদের এ উপন্যাসটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তিনি তার সন্তানদের প্রকৃত মানুষ রুপে গড়ার জন্য তাদের সংশোধন কল্পে উপন্যাসটি রচনা করেছেন। উপন্যাসটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৫ এবং ১২টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

এ উপন্যাসে নজির আহমেদ তৎকালীন দিল্লীর একটি সভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের কাহিনীকে কেন্দ্র করে গল্পের বিষয় বস্তু তুলে ধরেছেন।[৩১] পরিবারটির প্রধান ব্যক্তির নাম নাসুহ। সে স্বাধীন ভাবে নিজের ইচ্ছামত চলাফেরা করে। ধর্মীয় রীতিনীতি ও নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা করত না। তিন ছেলে, তিন মেয়ে ও তাঁর স্ত্রীসহ মোট ৮ জন সদস্য নিয়ে পরিবারটি গঠিত। ঔপন্যাসিক প্রথমে পরিবারটির নৈতিক অবনতি ও পরবর্তীতে পরিবারের প্রধান নাসুহ এর একটি স্বপ্নকে কেন্দ্র করে পরিবারের সংস্কারের চিত্র তুলে ধরেছেন। দিল্লীতে কলেরার প্রাদুর্ভাব হলে সেই কলেরায় আক্রান্ত অন্যান্যদের মত নাসুহও কলেরায় আক্রান্ত হয় এবং মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় এই নৈরাশ্যপূর্ণ পরিস্থিতিতে তার মনে আখেরাতের শেষ পরিণামের চিন্তা আসতে থাকে। এ সময় ডাক্তার তাকে ঔষধ দিলে সে ঘুমিয়ে পড়ে এবং সে এক ভীতিকর স্বপ্ন দেখতে পায়। ঘুম থেকে জেগে নাসুহ অতিতের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং স্বপ্নের কথা স্ত্রী ফাহমিদাকে বলে। পরিবারটি সংস্কারের নিমিত্তে নাসুহ তার স্ত্রী ফাহমিদার সাহায্য চাইলে সে এগিয়ে আসে। স্ত্রী ফাহমিদা ও মেজ মেয়ে হামিদার মধ্যে আলোচনা, নাসুহ ও ছোট ছেলে সেলিমের সংগে আলাপচারিতা, ফাহমিদা ও বড় মেয়ে নাঈমার মধ্যকার দ্বন্দ্ব, নাসুহ ও মেজ ছেলে আলিমের কথোপকথন, বড় ছেলে কলিমকে নাসুহও ফাহমিদা আলোচনার জন্য ডাকলেও সে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে না। এমনকি ফাহ্মিদা ও সেলিম তাকে বুঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। অবশেষে কলিম বাবার সাথে রাগ করে বাড়ী থেকে চলে যায়। আবার নাঈমাকে তার খালাত বোন সালেহা বুঝানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। নাঈমা খালাত বোনের সংগে তাঁর বাড়িতে চলে যায়। একারণে বাবা নাসুহ কলিমের ঘরের সমস্ত খারাপ বইপত্র জ্বালিয়ে দেয়। কলিম বন্ধু জাহেদার ও এক আত্মীয় ফিতরতের কাছে আশ্রয় চাইলে তারা উভয়েই তাকে অপমান করে। অবশেষে কলিম গ্রেপ্তার হয়। পরে সে পিতার সহযোগিতায় মুক্তি পেয়ে কলিম চাকুরির খোঁজে দৌলতবাদে যায় এবং সেখানে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়। সেখানে এক লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করলে

আহত হয় এবং দিল্লীতে ফিরে আসে। নাঈমা খালার বাড়িতে গিয়ে সবার সাহচর্যে নিজে নিজেই সংশোধন হয়ে যায়। নাঈমা বাবা-মার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়। তার অশান্তির সংসারে শান্তি নেমে আসে। কলিম বোনের বাড়িতে মৃত্যুবরণ করলে উপন্যাসটির সমাপ্তি ঘটে।[৩২]

উপন্যাসটি থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হল

১. মানুষের জীবনে চলার পথে অনেক ভুল-ক্রুটি হয়ে থাকে। ভুল করার পরেও মানুষের মনে যদি পাপ-বোধ বা অপরাধ-বোধ জাগ্রত হয় এবং ও অনুতপ্ত হয়ে সত্যিকারভাবে তাওবা করে ইসলামি আদর্শ ও সুন্দর জীবনে ফিরে আসে তাহলে ন্যায়, সত্য, সুন্দর ও ইসলামের সুমহান আদর্শে নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

২. সন্তানদের শৈশবকাল থেকেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া উচিত। কেননা বড় হলে তাদের সংশোধন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়।

৩. সন্তানদের সঠিক শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে সুনাগরিক, ধার্মিক ও চরিত্রবান ও সৎগুণ সম্পন্ন করে তোলার প্রধান দায়িত্ব হল পিতামাতার। উপরিউক্ত বিষয়গুলো হল ডেপুটি নজির আহমদের উপন্যাসের বিষয়বস্তু।[৩৩]

ফাসানা-এ-মুবতালা(فسانہ مبتلا): এ উপন্যাসটি ডেপুটি নজির আহমদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সামাজিক উপন্যাস। শৈল্পিক অবকাঠামো বিচারে এটি একটি সহজ সরল উপন্যাস। একজন হতভাগ্য ব্যক্তির দাম্পত্য জীবনকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। উপন্যাসটির প্রধান ও কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম মুবতালা। উপন্যাসটি ১৮৮৫ (খ্রী.) প্রকাশিত। উপন্যাসের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫৫।৩০টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এবং ১১ পৃষ্ঠা উর্দু থেকে উর্দু শব্দ কোষ। এতে রয়েছে একাধিক বিবাহের ক্ষতিকর দিক এবং এর ফলে পরিবার ও সমাজে যে অশান্তি ও অস্থিরতা এবং নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। সমাজে অশিক্ষা ও কুশিক্ষার কুফলের চিত্র ও ফুটে উঠেছে। উপন্যাসটির বিভিন্ন অনুচ্ছেদের মধ্যে মুবতালার শৈশব জীবনের ঘটনাবলি শিক্ষাজীবন, বিপদের সূচনা, মুবতালার চাচা মীর মুত্তাকি হজ্ব থেকে ফিরে এসে মুবতালা ও তার স্ত্রী গায়রতের ভাই সৈয়দ হাজিকে বোনের অর্থাৎ গায়রতকে প্রাপ্ত সম্পত্তির অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া, মুবতালাকে মীর মুত্তাকির বুঝানোর প্রভাব সম্পর্কে এ উপন্যাসে বর্ণনা করা হয়েছে। মীর মুত্তাকির বুঝানোর পরেও মুবতালার পরিবর্তন, মুবতালা ও হরিয়ালির প্রেম ও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ঘটনা, দুই সতীনের ঝগড়া বিবাদ ও গাইরত কর্তৃক হরিয়ালিকে বিষ প্রয়োগে হত্যার ঘটনা। দুই স্ত্রীর বিবাদের কারণে মুবতালার উভয়ের কাছে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি ঘটনাবলির কারণে মুবতালার অকাল বয়সে মৃত্যুবরণের ঘটনা এ উপন্যাসে নজির আহমদ উপস্থাপন করছেন। নজির আহমদ উপন্যাসটির সূচনা এভাবে করেছেন–

اے داغ بر دل از غم خال تو لالہ را
شر مندہ ساخت آہوے چشمت غزالہ رار[৩৪]

(হে হৃদয়ের উষ্ণতা লালা ফুলের শূণ্যতা দিয়ে আমাকে লজ্জিত করেছে
লজ্জিত হয়েছে তোমার হরিনী আঁখিও।)

মুবতালার যৌবনকালের উদ্দীপনা, সৌন্দর্য, একাধিক নারীর সংস্পর্শে আসার প্রবণতা, পতিতা নারীর প্রতি আকর্ষণ ও দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ঘটনাবলি এবং এর ফলে একটি পরিবারে করুণ পরিণতির চিত্র নজির আহমদ তার ফাসানায়ে- এ মুবতালা উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।[৩৫] দিল্লীর মীরমেহযব নামক এক ধনী ব্যক্তির একমাত্র সন্তান মুবতালা। সে লেখাপড়া ঠিকমতো করছিল না। খুব বেপরোয়াভাবে চলাফেরা করত। মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে তার ফুফাত বোন গাইরত বেগমের সাথে বিবাহ

বন্ধনে আবদ্ধ হয়। গাইরত বেগম ছিল অতি সাধারণ ও সহজ, সরল প্রকৃতির মেয়ে অপর দিকে মুবতালা ছিল অত্যন্ত বিলাস প্রিয় আমোদ প্রমদে লিপ্ত থাকা এব ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যক্তি। বাবা মার মৃত্যুর পরে গাইরত বেগমের ভাইয়েরা তাকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। ফলে সে শুধুমাত্র শ্বশুর বাড়ির পরিচয়েই বসবাস করতে থাকে। এদিকে মুবতালার চাচা হজ্ব থেকে বাড়িতে ফিরে তাঁর ভাইয়ের মৃত্যু এবং ভাতিজা মুবতালার বেপরোয়া হওয়ার ঘটনা শুনে অত্যন্ত ব্যথিত ও চিন্তিত হন। চাচা মুবতালাকে সঠিক উপদেশ ও তার ভুলগুলো ধরিয়ে দিয়ে খারাপ অভ্যাসগুলো থেকে দুরে রাখতে চেষ্টা করেন। ফলে মুবতালার মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এসময় হঠাৎ মীর মুত্তাকি রামপুরে যান। যাওয়ার সময় এক খোদাভক্ত ব্যক্তিকে মুবতালাকে দেখাশুনা করার জন্য রেখে যান। কিন্তু সে তার উপদেশ বা পরামর্শই মানে না বরং বিভিন্ন বিষয়ে তার সাথে তর্কও বিরোধিতা করে।

এমতাবস্থায় মুবতালা আরো বেপরোয়া, উশৃঙ্খল, ও আমোদ প্রমোদে মেতে উঠে। এসময় মুবতালার পরিচয় ঘটে লক্ষ্ণৌর এক পতিতা ও ব্যভিচারি মেয়ে হরইয়ালির সাথে মুবতালা অবৈধ প্রেমে আসক্ত হয়। চাচা মুবতালার এই ঘটনা শুনা মাত্রই বলেন এমন অবৈধ সম্পর্ক রাখার চেয়ে বিয়ে করে নেওয়াই ভাল। অবশেষে মুবতালা হরইয়ালিকে বিবাহ করে।[৩৬] বিয়ের পর হরইয়ালিকে মুবতালা কাজের মেয়ে পরিচয় দিয়ে বাড়িতে নিয়ে যায়। হরইয়ালি অতি অল্প সময়ের মধ্যে মুবতালার মন জয় করে নেয়। এভাবে ধীরে ধীরে গাইরত বেগমের সাথে মুবতালার দূরত্ব বেড়ে যায়। একদিন হঠাৎ এক বৃদ্ধা গাইরত বেগমকে মুবতালা ও হরইয়ালির গোপন বিবাহের কথা বললে গাইরত বেগম অত্যন্ত রাগান্বিত হয়। এমতাবস্থায় গাইরত বেগমের দুইভাই সেখানে উপস্থিত হয় এবং হরইয়ালিকে আলাদা বাড়ীতে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এদিকে মুবতালার দ্বিতীয় বিবাহের কারণে গাইরত বেগম অত্যন্ত দুঃখ ও মনোকষ্টে তার ব্যবহার ও আচার-আচরণ অত্যন্ত রূঢ় হয়ে যায়। ফলে মুবতালা হরইয়ালির প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।এদিকে গাইরত বেগম প্রতিশোধ নেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং হরইয়ালিকে হত্যার জন্য কাজের লোকের মাধ্যমে দুধে বিষ মিশিয়ে হরইয়ালির কাছে পাঠায়। হরইয়ালি সেই দুধ দিয়ে পায়েস বানায়ে প্রথমে বাড়ির পোষা প্রাণিকে খাওয়ালে সে মারা যায়। ফলে হরইয়ালি গাইরত বেগমের বিরুদ্ধে মামলা করে। মুবতালা গাইয়ত বেগমকে আইনগত শাস্তি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে এবং নাজিরের কূট বুদ্ধিতে সর্বশান্ত হয়ে পড়ে। এভাবে হরইয়ালি ও মুবতালার মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হয়।[৩৭] ফলে মুবতালা দুই স্ত্রীর বাড়িতে যাতায়াত বন্ধ করে দেয়। এসব ঘটনার কারণে মুবতালা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে যায় এবং দুই বিবাহের জ্বালাও মনোকষ্টে অতি অল্প বয়সেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মুবতালার মৃত্যুর সংগে সংগে মাল ও আসবাব-পত্র নিয়ে হরইয়ালি পলায়ন করে এবং মাত্র ছয়মাসের মধ্যে মুবতালার মৃত্যুশোকে গাইরত বেগমও মৃত্যুবরণ করে।

এবনুল ওয়াক্ত (ابن الوقت): এবনুল ওয়াক্ত উপন্যাসটি ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত হয়। এটি নজির আহমদের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও খ্যাতিসম্পন্ন উপন্যাস যা তৎকালের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। ভারত বর্ষে ইংরেজদের আগমন, রাজত্ব কায়েম ও রাজনৈতিক দখল দারিত্বের ফলে অবিভক্ত ভারতের বাহ্যিক অবয়ব, আকার-আকৃতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, বেশভূষা, রীতিনীতি ইত্যাদি কীভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তার বাস্তবচিত্র অঙ্কিত হয়েছে এ উপন্যাসে। এছাড়া ইংরেজদের অন্ধ অনুকরণের ফলে মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষা,সামাজিকতা ও সার্বিক উন্নয়নে যে ধস নেমেছিল তার চিত্র নজির আহমদ এ উপন্যাসের মধ্যে তুলে ধরেছেন। এখানে নজির আহমদ মুসলমানদের মধ্যে একশ্রেণি মানুষের নিজস্ব কৃষ্টি কালচার ও ধর্মীয় মূল্যবোধের বিপরীত ইংরেজ তোষণ নীতিকে কটাক্ষ করেছেন। এ উপন্যাসের মূল চরিত্র এবনুল ওয়াকত এর মাধ্যমে বাস্তবমুখি শিক্ষার বর্ণনা করা রয়েছে।

কোন কোন ঐতিহাসিক এ উপন্যাসটিকে খোদ নজির আহমদের আত্মজীবনী হিসাবে উল্লেখ করছেন।[৩৮] আবার কেউ কেউ এবনুল ওয়াকত চরিত্রটি স্যার সৈয়দ আহমদেরকে বুঝিয়েছেন। এ প্রসংগে সৈয়দ ইফতেখার আহমদ হায়াতুন নজির গ্রন্থের ৩৬ পৃষ্ঠায় বলেন স্যার সৈয়দ আহমদের ছেলে সৈয়দ মাহমুদ অভিযোগ করে বলেন যে, নজির আহমদ স্যার সৈয়দ আহমদ খান সম্পর্কে এ উপন্যাসটি লিখেছেন। তার উত্তরে নজির আহমেদ এভাবে বলেছেন–

انگریزی وضع کے مقلدوں کو ملاحی گالیاں دی ہیں جوچاہیے گالیاں اپنے اوپر لے[৩৯]

(ইংরেজ অনুগতদের এ ভাবেই গালি দেওয়া হয়েছে। কেউ চাইলে এ গালি তার উপরেও বর্তাবে।)

নজির আহমদের এ উপন্যাসটি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এ উপন্যাসে তিনি ঘরোয়া ওমেয়েলি চরিত্র থেকে বেরিয়ে রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করছেন।১৯৬১ সালে রিপন প্রেস লাহোর থেকে প্রকাশিত এবনুল ওয়াক্‌ত উপন্যাসটিতে ৩৫০পৃষ্ঠাও ২৮টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এখানে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় নোবেল নামক এক ইংরেজকে এবনুল ওয়াক্‌ত মুক্ত করে তার সংগে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। এবং ইংরেজদের পোশাক-পরিচ্ছদ, আকার-আকৃতি ও বাহ্যিক অবয়ব গ্রহণ করে। বিদ্রোহ শেষে এবনুল ওয়াকত এর সংগে নোবেল সাহেবের প্রথম সাক্ষাৎ এবং একসাথে খাবার খাওয়া, ইংরেজদের বেশভূষা গ্রহণ করার জন্য নোবেল সাহেবের আমন্ত্রণ, খাবার পর এবনুল ওয়াকত এর ভাষণ প্রদান, ইংরেজদের পোষাক পরিচ্ছদ পড়ে ইসলামী দায়িত্বপালন করার অসুবিধা কালেক্টর এবং এবনুল ওয়াক্‌ত এর মধ্যে দ্বন্দ্ব, হুজ্জাতুল ইসলাম ও এবনুল ওয়াক্‌ত এর মধ্যে সাক্ষাৎ, ধর্মীয় বিষয়ে দুজনের আলোচনা তর্ক-বির্তক পরিশেষে হুজ্জাতুল ইসলামের সাথে এবনুল ওয়াকত এর সাথে রাজনীতিবিষয়ে আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ে আলাপচারিতার প্রসংগ।

এবনুল ওয়াক্‌ত ভারতের উচ্চশিক্ষিত মুসলিম পরিবারের এক সন্তানের নাম। উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার কারণে ইংরেজদের সাথে তাদের যোগাযোগ ছিল। এবনুল ওয়াকত মাদ্রাসা থেকে আরবী-ফারসি ও সংস্কৃত বিষয়ে উচ্চ ও ইংরেজীসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানঅর্জন করেন। ১৮৫৭ সালে দিল্লীতে বিদ্রোহ শুরু হলে তাদের আগের দিন মাসুক মহল বেগম এবনুল ওয়াকতকে হুকুম দেন বাহাত গা থেকে সকল মালামাল তার বাসায় নিয়ে এসে সেখানে বাড়িতে তালা দিতে। পরের দিন বিদ্রোহ শুরু হয় এবং অনেক কষ্টে এবনুল ওয়াকত মালামালগুলো জায়গা মত পৌঁছে দেয়। যুদ্ধ শুরুর কিছুদিন পর হঠাৎ মাসুক মহল গোলা বারুদের শব্দে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করে ফলে আসবাবপত্রগুলো পুনরায় রাহাত আরার গ্রামের বাসায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত হয়।

এবনুল ওয়াক্‌ত দুইজন কর্মচারিসহ রাস্তা দিয়ে আসার সময় ইংরেজদের কিছু মৃতদেহ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে এবনুল ওয়াক্‌ত অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়। এবনুল ওয়াক্‌ত এর অনুতাপ শুনে লুকিয়ে থাকা এক ইংরেজ ব্যক্তি হঠাৎ বেড়িয়ে তাদের সামনে আসল। তাঁর নাম জানে আলম। সে এবনুল ওয়াক্‌ত কে বলল-নোবেল সাহেবকে বিদ্রোহীরা বন্দি করে রেখেছে। এবনুল ওয়াক্‌ত এসময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নোবেল সাহেবকে বিদ্রোহীদের হাত থেকে রক্ষা করে ফুফুর বাড়ীতে আশ্রয় দেয়। সেখান অবস্থান করে নোবেল সাহেব সুস্থ হন। সেখানে অবস্থান কালে নোবেল সাহেব ভারত বর্ষের মানুষের জীবন-যাপন, সভ্যতা ও ইংরেজদের প্রতি মুসলমানদের অসন্তুষ্টির কারণ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য উদঘাটন করেন। অপরপক্ষে এবনুল ওয়াক্‌তও নোবেল সাহেবের কাছ থেকে ইংরেজদের চাল-চলন, রীতিনীতি, বিদ্রোহের কারণসমূহ জেনে নেয়। এসব জানার পরে এবনুল ওয়াক্‌তের মধ্যে পরিবর্তনের চিন্তাভাবনা আসে। এখানে অবস্থানের পরে ইংরেজদের ক্যাম্পে দিয়ে যাবার জন্য জান নেসারের মাধ্যমে একটি চিঠি পাঠায় ১৫দিন পর এবনুল ওয়াক্‌ত এ চিঠির উত্তর পান। বিদ্রোহ শুরু হয়। এ বিদ্রোহে নোবেল সাহেব এবনুল ওয়াক্‌তকে প্রত্যেক বিষয়ে সাহায্য করেন। বিদ্রোহ শেষ হলে ভারত বর্ষের দেখাশুনার ভার

ইংরেজরা নিজের হাতে নেয় এবং খুশিতে এক আনন্দ উৎসবের আয়োজন করে এবং এবনুল ওয়াক্তকে আমন্ত্রণ করে। ইংরেজরা তাকে সহকারী কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত করে। আস্তে আস্তে নোবেলের প্রভাবে এবনুল ওয়াক্ত ইংরেজদের বেশভূষা, আচার-আচরণ, রীতিনীতি, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং ইংরেজদের সহায়তায় সে প্রভাবশালী ব্যক্তিতে পরিণত হয়।

অবশেষে সে ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে পুরোপুরিভাবে স্বদেশী সমাজ পদ্ধতি ত্যাগ করে ইংরেজদের জীবন ধারা গ্রহণ করে। ভারতবর্ষের মুসলমানগণ এবনুল ওয়াক্ত এর এ পরিবর্তনকে ঘৃণার চোখে দেখেন এবং তারা বলতে লাগলো যে এবনুল ওয়াক্ত কুফুরি ও বেদায়াত কাজে লিপ্ত হয়েছে। তাঁর নামাজ পড়াকেও তারা কটাক্ষ করত। এভাবে সাধারণ জনগণের নিকট সে সংস্কারকের পরিবর্তে ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়। ১৮৫৯ সালে হঠাৎ নোবেল সাহেব অসুস্থতার কারণে ব্রিটেনে চলে গেলে এবনুল ওয়াকত বিপদের সম্মুখিন হয়। ফলে তাকে ইংরেজদের এলাকা ছেড়ে যেতে বলা হয়। এখানে শুধু ইংরেজরাই থাকবে। ফলে এবনুল ওয়াক্তকে বাংলো বাড়ি ছেড়ে দিতে বলা হয়। ইংরেজদের সাধারণ কর্মচারিরা পর্যন্ত তার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে থাকে। ফলে এবনুল ওয়াকত বুঝতে পারে ইংরেজদের জন্য এত কিছু করলেও তারা তাকে মন থেকে মেনে নেয়নি। এসময় বাধ্য হয়ে এবনুল ওয়াক্ত তার চাচাতো বোনের স্বামী হুজ্জাতুল-ইসলামের সহযোগিতা চায়। ধর্মীয় বিষয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে হুজ্জাতুল ইসলামের সাথে তার আলোচনা ও বাক বিতন্ডা হয়। হুজ্জাতুল ইসলাম তার যুক্তি ও কোরান হাদিসের প্রমাণের মাধ্যমে ইসলামের হুকুম ও আহকামের কথা তুলে ধরে। মিষ্টার সার্প যার সাথে এবনুল ওয়াকত এর মিল নেই তিনি হুজ্জাতুল ইসলামের আত্মীয়। হুজ্জাতুল ইসলাম একটি চিঠি লিখে মিষ্টার সার্পের সাথে দেখা করে বিভিন্ন আলাপের মাধ্যমে এবনুল ওয়াক্ত সম্পর্কে সঠিক তথ্যগুলো প্রদান করলে দুজনের মধ্যে সকল ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটে এবং হুজ্জাতুল ইসলাম এবনুল ওয়াক্তকে ইংরেজদের দাসত্ব থেকে বেড়িয়ে আসতে রাজি করান। অবশেষে এবনুল ওয়াকত বুঝতে পারে যে, শুধু ভারতবাসীই কুসংস্কারের মধ্যে ডুবে নেই। ইংরেজরাও কুসংরাচ্ছন্ন। এভাবেই উপন্যাসটি সমাপ্তি ঘটে[৪০]। মূলত: এ উপন্যাস নজির আহমদ বিজাতীয় জীবনপদ্ধতি শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির পরিবর্তে দেশীয় সংস্কৃতি, জীবনাদ্ধতি ও শিক্ষার প্রতি গুরুত্বআরোপ করেন এবং তিনি মনে করেন যে, যারা নিজ কৃষ্টি-কালচার ও তাহজীব ও তামাদ্দুনে বিশ্বাসী তারাই শ্রেষ্ঠ। উপন্যাসটি তৎকালীন ইংরেজ প্রশাসনের পাশ্চত্য রীতিনীতির বিরুদ্ধে এক জোড়ালো প্রতিবাদ।

অ্যায়্যামা (ایامی): এটি একটি সামাজিক উপন্যাস (১৮৯১ খ্রী.)। তিনি উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র বিধবা আযাদির মাধ্যমে মেয়েদের অনুমতি নিয়ে বিয়ে দেওয়া এবং দ্বিতীয় বিবাহের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। হিন্দু সমাজে তখন বিধবা নারীদের বিবাহ দেওয়ার বিধান ছিল না বরং কোন বিধবা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তাকে অপরাধী ভেবে সমাজচ্যুত করা হত। হিন্দু সমাজের এ রীতির সংস্পর্শে এসে তৎকালীন ভারতের মুসলিম সমাজেও বিধবাকে বিবাহ না দেওয়ার কুসংস্কারের প্রচলন হয়।[৪১] হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ অবৈধ হলেও ইসলামের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিধবা বিবাহ বৈধ। এ প্রসঙ্গটি নজির আহমদ তার আয়্যামা উপন্যাসে বিধবা আযাদির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। বিধবা আযাদির কণ্ঠে নজির আহমদ এভাবে বলেছেন–

اگر بیوہ عورتی ایسا خیال کریں تو ان پر الزام کی بات کیا ہے ۔ ان بیچاریوں کے
فوت ہوءی ہے۔ جن کی وجہ سے دنیا (৪২)شوہر فوت ہوی ہیں نہ کہ ان کی ضرورت
جہاں نکاح ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے خود ان کے پہلے نکاح ہوتے ہیں

(যদি বিধবা মহিলা এরকম ধারণা পোষণ (বিবাহ) করে তাহলে অভিযোগ হতে পারে না। (বিধবাদের) স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে কিন্তু তার (যৌন) প্রয়োজনীয়তার কোনো সমাপ্তি ঘটে নাই। এ কারনে পৃথিবীতে বিবাহের প্রচলন আছে ঠিক তেমনি বিধবাদেরও প্রথমবারের ন্যায় পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সমীচীন।)

কুরআন সুন্নাহ ও ইসলামি আইনের ভাষ্যমতে বিধবাদের দ্বিতীয় বিবাহ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং তাদের তাড়াতাড়ি বিবাহ দেওয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অথচ দেখা যায় যে, হিন্দুদের ধর্মীয় বিধি-নিষেধের সংস্পর্শে মুসলিম সমাজেও বিধবা বিবাহের প্রতি অনিহা দেখা যায়। উপন্যাসটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩০। ১৯ পরিচ্ছেদে বিভক্ত এ উপন্যাসে ভূমিকা, আযাদি বেগমের প্রাথমিক অবস্থা, শিক্ষাদীক্ষা, আযাদির ইংরেজ সমাজের সম্পর্কে অবগত হওয়া, আযাদির বিবাহের কথাবার্তা এবং নিজের বিয়ে সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা, মৌলভী মুস্তাজাবেরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, মৌলভী পেশা থেকে তাকে বিরত রাখা, মোস্তাজাবেরের চাকুরি নিয়ে ভুপাল যাওয়া ও সেখানে তার মৃত্যু এবং পরবর্তীতে মৌলভী মোক্তাদি কর্তৃক আযাদিকে ধৈর্য্য ধারনের উপদেশ, আযাদির স্বামীর প্রতি শোক ও বিধবা জীবনের মন-মানসিকতা ও আত্মহত্যার চেষ্টা, মুস্তাক নামের এক ব্যক্তি আযাদির পিছনে লেগে থাকা, একজন কুটনির মাধ্যমে আযাদির মন ঘুরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, আযাদির বাপের বাড়ি যাওয়ার সময় পালকি অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা এবং আযাদির শেষ জীবন নিয়েই উপন্যাসটির সমাপ্তি ঘটে। মূলত উপন্যাসটিতে নজির আহমদ মেয়েদের অনুমতি নিয়ে বিবাহ দেওয়া এবং ঘরে বিধবা থাকলে যতদুর সম্ভব অতি দ্রুত দ্বিতীয় বিবাহের ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। নইলে সমাজে বিধবাকে কেন্দ্র করে নানা বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে পারে বলে লেখক মন্তব্য করেছেন।

রুইয়া-এ-সাদেকা (رویاے صادقہ)**:** রুইয়া-এ-সাদিকা উপন্যাসটি একটি ধর্মীয় এবং নজির আহমেদের সর্বশেষ উপন্যাস যা ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয়। এখানে ঔপন্যাসিক সে যুগের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের আধুনিক ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ চিন্তাধারা, জীবন ও তাদের কর্ম তুলে ধরেছেন। আধুনিক শিক্ষার ভুল-ক্রটি ও আলীগড় কলেজের দুর্বলতার দিকগুলোকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসাবে তুলে ধরেছেন। সাদিকা ও তাঁর স্বামী সাদিককে কেন্দ্র করে উপন্যাসের সূচনা। প্রধান চরিত্র সাদিকা ভারতের মধ্যবিত্ত অতি সাধারণ মুসলিম পরিবারের সন্তান হলে ও সে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান আহরণ করেন। সাদিক আলীগড় কলেজের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও সে আধুনিক শিক্ষার নামে ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে ডুবেছিল। সাদিকা তার স্বামীরইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাগুলো দূর করেন। ফলে সাদেক তার স্ত্রীর বুদ্ধিমত্তা দেখে তার ভক্ত হয়ে যায়। সাদিকার স্বপ্নকে ঘিরেই এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু অবতারণা। সাদিকার এ স্বপ্ন সম্পর্কে নজির আহমদ এভাবে বলেন–

صادقہ کبھی فرمائشی خواب بھی دیکھتی تھی۔ یعنی ہم کو ایک بات معلوم کر نے
کی ضرورت ہے اور ہم نے درخواست کی جیسا کچھ ہونے والا ہوا صادقہ نے
خواب میں دیکھ لیا۔ مگر یہ بات اسی کے اختیار کی نہ تھی - بہترین مرتبہ ایسا ہوا
خواب دہکھنا چایا اور بھلا اور کچھ بھی نہ دیا [৪৩]کہ صادقہ نے

(সাদিকা কখনো প্রয়োজনীয় স্বপ্ন দেখছিল। আমাকে একটি বিষয়ে জানানোর প্রয়োজন আছে এবং আমি আবেদন করেছি যা, তা ঘটে যাওয়ার কথা ছিল, এ কথাটি সাদিকা স্বপ্নে দেখেছে। কিন্তু যদিও এ কথা বলার এখতিয়ার সাদিকার ছিল না। প্রকৃত পক্ষে সাদিকা ভালো কিছু স্বপ্ন দেখতে চেয়েছে।)

৩২০পৃষ্ঠা সম্বলিত উপন্যাসটি ১৩টি পরিচ্ছেদে সাদিক ও সাদেকা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। সংস্কারধর্মী উপন্যাসটিকে সাদিকার বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সাদিকার স্বপ্ন, সাদিকের প্রস্তাব গ্রহণ সম্পর্কে পরিবারে আলোচনা, দিল্লীতে মুসলিম সমাজ, সাদেকার ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত বুদ্ধিমত্তা ছাড়া আল্লাহর একত্ববাদ, গুণাবলী, আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস, ধর্মের প্রয়োজনীয়তা, শরিয়াত ও ধর্ম, শিয়া সুন্নী মতানৈক্য, সুফিবাদ জড়বাদ ওহী, মোজেজা এবং অলৌকিক ঘটনাবলি।[৪৪] সাদেকা কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম। সাদেকাকে সত্যাবাদি, ইমানদার এবং সংস্কারক হিসাবে দেখানো

হয়েছে। সে সত্য কথা বলত এবং সত্য স্বপ্ন দেখত। সে যে স্বপ্ন দেখত তা বাস্তবেও ঘটে যেত।[৪৫] সাদেকার স্বামী সাদেকও এ উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র। ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করত। তাঁর ভ্রান্ত ধারণাকে যুক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করে সাদেকা। সাদেকা ধর্মীয় বিষয়ে স্বপ্ন দেখলে সাদেককে স্বপ্নের কথা বিস্তারিত ভাবে বললে সাদেক মেনে নেয়। হামরাজের চরিত্রটি মধ্যস্থতাকারী হিসাবে দেখানো হয়েছে। মূলতঃ নজির আহমদের রুইয়া-এ সাদেকা উপন্যাসটি সর্বশেষ শিল্পকর্ম। উপন্যাসটিতে ধর্মের বিভিন্ন বিষয়কে সমাজের মানুষকে তিনি ঠিক তথ্য প্রদান করেছিলেন। মানুষের মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে ঠিক জ্ঞান না থাকায় বিভিন্ন ধরনের কুংস্কার ও অপসংস্কৃতিতে জড়িয়ে পড়েছিল তৎকালীন সমাজের ব্যক্তিবর্গ। আর এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে সমাজে নানাবিধ কুসংস্কার, অস্থিরতা বিশৃংঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

উপসংহার

ডেপুটি নজির আহমদ উর্দু সাহিত্যের একজন স্বার্থক ও প্রথম ঔপন্যাসিক। তিনি জীবদ্দশায় মোট ৭টি স্বার্থক উপন্যাস রচনা করেন। নজির আহমদ তৎকালিন মুসলিম সমাজকে জাগ্রত করার জন্য উপন্যাস রচনা করেন। তন্মধ্যে নারীর আধুনিক শিক্ষা, সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের জীবন পদ্ধতি, বিধবা বিবাহ, দ্বিতীয় বিবাহের কুফল এবং ধর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়াবলীকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের বিষয়বস্তুর অবতারণা করেছেন। তিনি মুসলিম সমাজের পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে মুসলিম ধর্মের ভুল ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করেছেন। তিনি উপন্যাসের বিষয়বস্তু তৎকালিন সাধারণ মানুষের জীবন থেকে নিয়েছেন। নজির আহমদ সমাজে নারীদের গৃহস্থালি কাজকর্ম ও ব্যবস্থাপনা কৌশলাদি এবং নারীদের আচার-আচরণের মধ্যে যে ভুল-ত্রুটি রয়েছে তা উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে জীবন্ত করে তুলেছেন। এছাড়া নারীদের ঘরোয়া জীবনযাপনের পদ্ধতিও তুলে ধরেছেন। সন্তানদের ঠিক ও যুগোপযোগী ও আধুনিক শিক্ষা প্রদান করে তাদের প্রকৃত মানুষরূপে গঠনের লক্ষ্যে সুশিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব পিতামাতার বলে উল্লেখ করেছেন। প্রাথমিক জীবনের উপন্যাসের শৈল্পিক কিছুটা কম পরিলক্ষিত হলেও উপন্যাসের প্লটনির্মাণ, ঘটনার বর্ণনা ও চরিত্র বিন্যাসে সার্থকতার দাবীদার। তিনি উপন্যাসে সহজ, সরল, ভাষার ব্যবহার করেছেন। এছাড়া দৃশ্যের বর্ণনা, ঘটনার বর্ণনা, কথোপকথন, বাগধারা, প্রবাদবচন ইত্যাদি বিষয়াবলি অত্যন্ত নিখুতভাবে উপস্থাপন করেছেন। মূলত ডেপুটি নজির আহমদতৎকালীন ভারতীয় সমাজের পিছিয়ে পড়া জাতির উন্নয়নে কাজ করেছেন। সমাজের বাস্তব ঘটনাবলিকে সামনে রেখে তিনি উর্দুভাষী পাঠককে সচেতন করতে প্রয়াস চালিয়েছেন। তাঁর রচিত প্রতিটি গ্রন্থ তৎকালীন মুসলিম সমাজ, বিশেষত ভারতের অবহেলিত মুসলিম নারী সমাজকে আলোড়িত করে। এ সকল গ্রন্থ যেভাবে তৎকালিন ভারতীয় সমাজকে পথ দেখিয়েছে তার প্রয়োজনীয়তা আজো বিদ্যমান। তাই বলা যায়, ডেপুটি নজির আহমদ উর্দুভাষী পাঠকদের জন্য এক অবিস্মরণীয় অগ্রপথিক।

গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যনির্দেশ

১. বশির মাহমুদ আখতার,*নজির আহমদ কি নভেল নিগারী কা ফন*,(লায়েলপুরঃ নাফিস প্রিন্টিং প্রেস-১৯৬৬) পৃঃ ০১।
২. প্রফেসর মাহমুদ বেরলভী, *মোখতাছার তারিখে-ই-আদাবে-উর্দু(*লাহোর শাইখ গোলাম আলী এন্ড সন্স-১৯৮৫) পৃঃ ৩৭৭।
৩. রামবাবু সাকসেনা, তারিখ-ই-আদাবে-এ- উর্দু (লক্ষ্মৌ:মাতবা-এ মুনসি তেজকুমার প্রাইভেট লিঃ ১৯৮৬) পৃঃ ৫৫।

৪. নজির আহমদ, *এবনুল ওয়াকত*, (লাহোরঃ উর্দু পাবলিক রাইব্রেরী-২০০৬), পৃঃ ১।
৫. নজির আহমদ, *এবনুল ওয়াকত, প্রাগুক্ত।*
৬. বশির মাহমুদ আখতার,*নজির আহমদ কি নভেল নিগারী কা ফন*- প্রাগুক্ত,পৃঃ ৪-৫।
৭. রামবাবু সাকসেনা, *তারিখ-ই-আদাবে-এ- উর্দু*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০-৬২।
৮. ড. মুফতি মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী, *উর্দু সাহিত্যে খ্যাতিমান আলিমদের অবদান, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ-২০১৪), পৃঃ ১২১-১২২।*
৯. নজির আহমদ, *বানাতুন না'শ (লাহোর উর্দু একাডেমি-১৯৬৭)।*
১০. *প্রাগুক্ত-পৃঃ ৩।*
১১. ড. মুফতি মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী, *উর্দু সাহিত্যে খ্যাতিমান আলিমদের অবদান, পৃঃ ১২৪।*
১২. *প্রাগুক্ত,পৃঃ ১২৪-১২৫।*
১৩. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলা পিডিয়া*, ২য় খণ্ড (ঢাকা- এশিয়াটিক সোসাইটি ২০০৩, পৃঃ ১৭।
১৪. *The Encylopidia of America, International Edn vol 20*(n,d) p-510-f
১৫. R.A Scott James, *The maxagy of literature* (London 1958) p-244
১৬. J muller, *The idea of Fiction* (New York 1937) p-39
১৭. সৈয়দ মুনির আলী জাফরী, *জাদিদ উর্দু আদাবিয়াত*(করাচি, বুক ল্যান্ড পাবলিশার্স ১৯৯২), পৃঃ ৫৭।
১৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৭।
১৯. ড. খালেদ আশরাফ,*বররে ছগির মে উর্দু নভেল*, (দিল্লীঃ এডুকেশনাল পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৪) পৃঃ ৯।
২০. নুরুল হাসান নক্বী, *তারিখ-ই- উর্দু*- প্রাগুক্ত, পৃ-৩০৯-৩১১, নজির আহমদ, মিরাতুল আরুস, পৃঃ ৩-৫।
২১. নজির আহমদ, *মিরাতুল আরুস*, পৃঃ ৪০-৪৫।
২২. বশির মাহমুদ আখতার,*নজির আহমদ কি নভেল নিগারী কা ফন*,পৃঃ ৫৯।
২৩. নজির আহমদ, *মিরাতুল আরুস*, পৃ-৫৭।
২৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০।
২৫. রশিদুল আলম, *গবেষণা পত্রিকা* (কলা অনুষদ) (রাজশাহী বিশ্বদ্যিালয়, ২১তম সংখ্যা ২০১৫-১৬), পৃঃ ১৪৬।
২৬. ড. মুহাম্মদ আহসান ফারুকি, *উর্দু কি তানকিদি তারিখ*(লক্ষ্মৌঃ এদারা-এ ফুরুগ উর্দু-১৯৬২), পৃঃ ৫৮।
২৭. ড. মুফতি মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী, *উর্দু সাহিত্যে খ্যাতিমান আলিমদের অবদান, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ-২০১৪)*, পৃঃ ১৯২।
২৮. বশির মাহমুদ আখতার,*নজির আহমদ কি নভের নিগারী কা ফন*, পৃঃ ৮০-৮১।
২৯. নজির আহমদ, *বানাতুন না'শ*,পৃঃ ১৮।
৩০. বশির মাহমুদ আখতার,নজির আহমদ কি নভেল নিগারী কা *ফন*,পৃঃ ৮২।
৩১. ড.সালাম খান্দোলবী, *আদব কা তানকিদি মোতালেয়া* (লক্ষ্মৌঃ নাসিম বুক ডিপুঃ ১৯৮৬), পৃঃ ১৮৯।
৩২. নজির আহমদ, *তাওবাতুন নাসুহ*, (করাচিঃ এডুকেশনাল প্রেস তা;বি) পৃঃ মোকাদ্দামা-৩নং।
৩৩. ড. মুফতি মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী, *উর্দু সাহিত্যে খ্যাতিমান আলিমদের অবদান, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ-২০১৪), পৃঃ ১৯৩-১৯৫।*
৩৪. নজির আহমদ,*ফাসানা-ই-মুবতালা*, (লাহোরঃ এদারা-ই নু চকমিনার আনার কলি, ১৯৬০), পৃঃ ৮।
৩৫. *প্রাগুক্ত,পৃঃ১-৪।*
৩৬. নজির আহমদ,*ফাসানা-ই-মুবতালা*,পৃঃ ১১২-১৫৫।
৩৭. বশির মাহমুদ আখতার,*নজির আহমদ কি নভেল নিগারী কা ফন*,পৃঃ ১৫০-১৫২।
৩৮. ড. ইউনুস খরমস্ত, *বিসবি সিদি মে উর্দু নভেল*, (দেহলীঃ মাসমুলা-ই-ইওয়ানে উর্দু ১৯৯৬), পৃঃ ৯১০।
৩৯. ড. মুফতি মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী, *উর্দু সাহিত্যে খ্যাতিমান আলিমদের অবদান*, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ-২০১৪), পৃঃ১৯৬।
৪০. নজির আহমদ,*ফাসানা-ই-মুবতালা*,পৃঃ ১১২-১১৪।
৪১. ড. ইউনুস খরমস্ত, *বিসবি সিদি মে উর্দু নভেল*, পৃঃ৩৩-৩৪।

৪২. নজির আহমদ, *আয়ামা*, (লক্ষ্মৌঃ উত্তর প্রদেশ উর্দু একাডেমি ২০১৫), পৃঃ ১৩।
৪৩. নজির আহমদ, *রুয়ায়ে সাদিকাহ*, (লাহোরঃ শেখ মোবারক আলী তাজেরে কুতুব আন্দোমন (লাহোরী দরওয়াজে তা; রিঃ) পৃঃ ৫-৬।
৪৪. নজির আহমদ, *রুয়ায়ে সাদিকাহ*, পৃঃ মোকদ্দামা (ভূমিকা)
৪৫. ড.সালাম খান্দোলবী, *আদব কা তানকিদি মোতালেয়া* (লক্ষ্মৌঃ নাসিম বুক ডিপুঃ ১৯৮৬) পৃঃ ১৮৯।